"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্ত্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৬ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৬তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ / 24.09.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৬ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাগবতপ্রীতি	শ্রী নির্মল নারায়ণ গুপ্ত
সাহিত্যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সৃষ্টি’	ব্রহ্মচারী তুলসী
মহাবলের মহাবালেশ্বর	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
ছবির দেশে	শ্রী মুক্তিনাথ গুপ্ত
একাকী জীবন	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া
নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

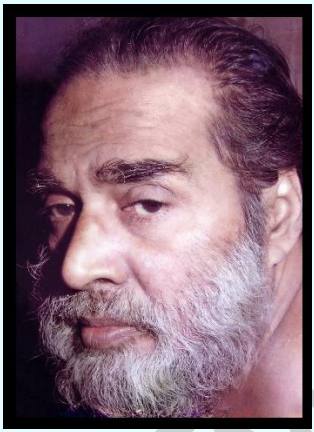

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

" ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যেই রয়েছেন, তা জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক। আমাদের মধ্যে অবস্থিত এই ঈশ্বরের জন্যই যেমন আমরা জীবন ধারণ করি, তেমনই কর্মও সম্পাদন করতে পারি - সর্বদা এই উপলব্ধি হৃদয়ে পোষণ করতে পারলে অহং থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ঈশ্বরে শরণ নিতে হবে, আমাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় হৃদয় বুদ্ধি ইচ্ছা ও কর্ম নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে তখন আমাদের ভিতর ভাগবৎ প্রেম ও জ্যোতি নেমে আসবে। "

আত্ম-কথা **শুক্লা ঘোষ**

আমাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি মাথার উপর তিনি সশরীরে না থাকাতে কি অসুবিধা হয়। সর্বদা একটা অনুভূতি এই বোধ হয় কি ত্রুটি হয়ে গেলো। পরিশ্রমের বোঝাতো হালকা হয়নি। আমি অর্থনৈতিক ও সাংসারিক জীবনে খুব স্বাবলম্বী। আমি চাই না আমার জন্য কারো কাজ আটকে থাকে বা আমার জন্য কারও কাজ বাড়ে। সেই হিসেবে চলবার চেষ্টা করি।

১৯৮৬ সালে আমি যেখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম আজ ১৯৯৩ সালে সেখানে নেই। আগে যে শিশুটির উপর আমার সম্পূর্ণ আদর, স্নেহ, ভালোবাসার জোর খাটাতে পারতাম, আজকের এ শিশুটির উপর আমার সে অধিকার নেই। মনে হয় তাকে যেটুকু লালন পালন করতে পারছি সেটা আমার ভাগ্য। আমার স্বামী বলতেন – তিনি সংসারে ঝাঁটার কাজ করেন, সব ময়লা পরিষ্কার করেন। আমার মনে হয় যাবার আগে সে দায়িত্বটা আমাকে দিয়ে গেছেন। যে চলা ১৯৫৭ সালে শুরু হয়েছে, আজও তার শেষ নেই। আমার এখন চলবার সাথে সাথে দেখবার পালা। আগে দেখতাম না, শ্রীপ্রীতিকুমার দেখতেন। সব কথাতে সতর্ক করে দিতেন। এখন দেখছি যাদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাদের অগ্রগতি কত দ্রুত। ছোটবেলা থেকেই রাগ হলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাওয়া অভ্যাস ছিল। ফলে বাবাকে খুবই টানাপোড়েন করতে হতো। শ্রীপ্রীতিকুমারও এই অসুবিধা ভোগ করেছেন। তাই সীতাপুরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বলেছিলেন, "এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গোবে না। " আজও ইচ্ছে করে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাই। পারি না। কেমন যেন ভয় করে। তাঁর কথা না শুনলে যদি কোনও ক্ষতি হয়ে যায়! তাছাড়া এ বয়সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকাটা শোভা পায় না। সংসারের যে charm সেটা আমার আগেও ছিলো না, এখন তো নেইই। গত ছ' বছরে আমি জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলেছি। তাই আমার পরাজিত হবার ভয় নেই।

অহঙ্কার আমার আছে। সে অহঙ্কার শ্রীপ্রীতিকুমার মনের মধ্যে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই – আমি কিশোর নীরেনদা বা মনু গীতাদির উপর যতটা নির্ভর করি নিজের সন্তান বা আপনজনদের সম্বন্ধে ততটা করিনা। আর করিনা বলেই অনেকে পারলে আমাকে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু বিষয় সম্পত্তি বড় কঠিন বাস্তব। রেস্তর অভাব ঘটলে ছেলেমেয়েও পর হয়ে যায়। এ সত্য সার্বজনীন, সর্বকালীন।

শ্রীপ্রীতিকুমারের ভাইবোনের প্রতি অসম্ভব স্নেহ মায়া মমতা ছিল। আর সেটা ছিল বলেই আমি তাদের ভালোবাসতে পেরেছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম। আমার বড়বৌদির সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হয় না, তবু তার সম্বন্ধে অসম্ভব শ্রদ্ধা আছে। ভালো জিনিসটা নিজে না রেখে দেওর বা ননদকে দিয়ে দিতে সে-ই শিখিয়েছে। ছোট্ট শিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলবার শিক্ষা আমার তার কাছেই। যে যেটুকু করে সেটা স্বীকার না করলে ঈশ্বরের কাছে অপরাধ করা হয়। জীবনের শেষভাগে এসে একবার পিছন ফিরে তাকালামই বা!

শ্রীপ্রীতিকুমারের স্ত্রী বলে অনেকে তাঁর অবর্তমানে আমাকে একটু অন্য চোখে দেখেন আমার মনে হয়। তাঁর জন্য আমি খুব বিব্রত বোধ করি। আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে প্রতিনিয়ত তাদের মঙ্গলকামনা করি। আমার মনে হয় তিনি সশরীরে না থাকাতে আমাকে অনেক মেপে চলতে হচ্ছে।

এবার ঠিক করেছি "দিনপঞ্জী" লেখা অভ্যেস করব। তাহলে অন্ততঃ শ্রীপ্রীতিকুমারের বংশধর জানতে পারবে তাদের কাছে পাওয়ার জন্য আমরা কতদূর এগিয়েছিলাম, কত সামর্থ্য ব্যয় করেছিলাম। তাদের দেখবার জন্য খুব মন কেমন করে – সেই জায়গাটা থেকে আমাকে সরে আসতে হবে, না হলে আমার মুক্তি নেই। ঐ যে শ্রীপ্রীতিকুমারকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম – তাদের আমি দেখব! সেই অঙ্গীকার পালন করতে না পারবার যন্ত্রণা আমার মতো আর কে পাচ্ছে? এখন

মনে হয় তারা যেখানে আছে সেখানে থাকুক। কে তাদের জন্য extra load নেবে? আমি তো অমর নই! তাই নতুন করে আবার সংসারে বিষবৃক্ষ রোপন নাইবা করে গেলাম।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন আসছে। আবার সবাই আসবেন এ বাড়িতে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর মধ্যে কেউ কেউ খবরাখবর নিয়ে যাবেন আমরা ভালো আছি না খারাপ আছি, মোটা হয়েছি না রোগা হয়েছি। শাশুড়ি বৌয়ের ভাব আছে না বিবাদ আছে, ছেলের কথাবার্তা কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে জানিয়ে যাবেন তাদের পুত্র বা পুত্রবধূ আমার বা আমার পুত্তর সম্বন্ধে কি কি আলোচনা করেছে বা নিন্দা করেছে। আবার তাঁরাই নিজগৃহে ফিরে বলবেন আমি তাদের নামে কত কথা বলেছি, কত রাগ করেছি। যারা আমাকে এতদিন একান্তভাবে সহায়তা করে আসছেন সেটা শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধাবোধ থেকে। আমার নিজস্ব কোনও গুণই নেই। তবু আমি চেষ্টা করি সবার সাথে সম্পর্ক রাখতে। অনেকে আপদে বিপদে আমার কাছে বিশেষ অনুরোধ রাখেন। আমার মনের জোরে-ভালোবাসার টানে আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে প্রার্থনা জানাই। আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রীপ্রীতিকুমার পর্ব শেষ হয়ে যাবে তা বলছি না – তবু একটা বিরাট circle চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে।

পার্থসারথি পত্রিকা শ্রীপ্রীতিকুমারের জীবনের সাধনার অঙ্গ। আমি গত ছ' বছর ধরে সেটি টেনে তোলবার চেষ্টা করেছি অর্থনৈতিক দিক থেকে। প্রকাশনার ব্যাপারটা সামলেছে আমাদের পুত্তর। এবার আমারও বোধহয় পরিশ্রমে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমার প্রচেষ্টা সফল করতে সকলেই নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন। কাগজ কলম নিয়ে বসবার সময় বা আগ্রহ কোনটাই আমি পাই না। এটাকেই কি ভীমরতি বলে?

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যে ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমি বড় হয়েছি আজ তাঁর অবর্তমানে বড় অসহায় হয়ে পড়ি। মানুষ সর্বদা sweet memory-গুলি মনে রাখে। আমার এই সংগ্রামময় সমস্যাবহুল জীবনে সেই স্মৃতিই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে

যেতে সাহায্য করে। না হলে আর বাঁচব কি নিয়ে? অনুরাধাদি বহু বছর আগে আমাকে একটি কথা বলেছিলেন – "নিষ্কাম কর্মযোগ।" আজও প্রতিপদে আমার সেই উপদেশটি মনে পড়ে। গীতা পড়ি বটে কিন্তু সব শ্লোক তো সহজ লাগে না। দু'টি বা চারটি শব্দের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করি। সেও তো বিপদে পড়লে। ভালো থাকলে কে আর কবে ঈশ্বরের কাছে মাথা কোটবার সময় পেয়েছে?

শ্রীপ্রীতিকুমার মনে প্রাণে শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী ছিলেন। শ্রীমায়ের বাণীগুলি, সুন্দর করে লেখা, তাঁর টেবিলে বাঁধানো থাকতো। খুব অল্প বয়সে যখন ছাত্রী ছিলাম একটি বাণী - সম্ভবতঃ – "একমাত্র কাজ হল লেগে থাকা" – এই কথাটা আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু নিজের জীবনে ও কথাটি পালন করলাম কই? শ্রীপ্রীতিকুমারের আহ্লাদে, বাবার আদরে আমি তো বরাবরই বেপরোয়া রয়ে গেলাম। আজ কিন্তু কারো সাথে কোনও বিরোধেই যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সবার সাথে আমার ভাব ভালোবাসার আদান প্রদান থাকুক।

যাই হোক এ সংখ্যায় আমি কাউকে জ্ঞান দিতে বসিনি। আমার নিজের এখন যথেষ্ঠ জ্ঞানের দরকার, যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতার দরকার। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হলে কি কি ঘোটতে পারে, কে কেমন আচরণ করতে পারে এই অভিজ্ঞতাটাই তো আমার এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমার এখনও দীর্ঘকাল শেখা চলবে। সত্যিই তো শিক্ষার শেষ নেই। .....

বাচেন্দ্রী ভালো আছে। বড় হচ্ছে। তাঁর নামের আভিধানিক অর্থ আলাদা করে পাই নি। বড়জনের নাম ছিল "জুনকো"। পৃথিবীতে প্রথম মহিলা "এভারেস্ট" আরোহিনী। এর নাম "বাচেন্দ্রী" – ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা "এভারেস্ট" আরোহিনী। আমার অভিধানে এর চেয়ে ভালো নাম আর নেই। আমি এখনও আশা করি বাচেন্দ্রী একদিন তাঁর বাবা, মা, ঠাকুমার মতো পর্বতাভিযানে অংশগ্রহণ করবে। আমি যতদিন বাঁচবো ঐ কাজে লেগে থাকবো।

সেক্ষেত্রে "নিষ্কাম কর্মযোগ" কথাটি প্রযোজ্য কি? পাহাড়ে চড়াটা নিষ্কাম হলে মোটেই হবে না। তাই বাচেন্দ্রীকে তৈরী করতে হলে 'কর্মযোগ' শব্দটা মনে রাখতে হবে .....

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – জানুয়ারি, ১৯৯৩)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাগবতপ্রীতি **শ্রী নির্মল নারায়ণ গুপ্ত**

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনে পুরাণের, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাত্রেই সমাদৃত। বিষ্ণুপুরী মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ যত মহাজন শ্রীচৈতন্যতরুর মূলরূপে বন্দিত হয়েছেন, সকলেই ছিলেন ভাগবত প্রেমিক। বিষ্ণুপুরী সঙ্কলিত 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' ভাগবত ভিত্তিক রচনা। মাধবেন্দ্রপুরী নবদ্বীপে ভাগবত চর্চার ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করে নব হিল্লোল প্রবাহিত করলেন। চূড়ামণি দাসের 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়' পুঁথিতে আছে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর শিষ্য অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্রর ঘরে গিয়েছিলেন এবং ভাগবত পুঁথি পাঠ করে সকলকে পরম আনন্দ দান করেছিলেন। জয়ানন্দের 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' পুঁথিতে আছে মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র 'শ্রীভাগবত পড়েন গোবিন্দ সমীপে' {পৃঃ ১১, এশিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত সংস্করণ]। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপও ছিলেন ভাগবতরসের রসিক। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ মুরারি গুপ্ত লিখেছেন, বিশ্বরূপ 'শ্রীমদ্ভাগবৎরসাস্বাদমত্তো নিরন্তরম'। [শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত ১০/২য় সর্গ]

সুতরাং সমাজ পরিবেশের মত গৃহ পরিবেশেও শ্রীচৈতন্য ভাগবত চর্চার পরিমণ্ডল লাভ করেছিলেন। তাঁর দিব্য জীবনের অন্যতম প্রধান করণীয় ছিল ভাগবত

প্রচার ও ভাগবত চর্চায় উৎসাহ দান। আসাম, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা – সর্বত্র আঞ্চলিক ভাষায় ভাগবত অনুবাদে তাঁর প্রেরণা ফলবতী হয়ে উঠেছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শঙ্করদেব ছিলেন আসামের এক মহাপুরুষ। শঙ্করদেবের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাধব ও দামোদর। দামোদরের শিষ্যবর্গ 'দামোদরিয়া সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করেন। দামোদর শিষ্য কৃষ্ণ ভারতী 'সন্ত নির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভাগবত প্রচার বিষয়ে লিখেছেন "শ্রীভাগবত আমারই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল"। আসামের আরেকজন প্রাচীন গ্রন্থকার কৃষ্ণ আচার্য লিখেছেন-

"বরাহকুণ্ডর উপর গোঁকাত চৈতন্য প্রভু রহিলা।
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই ভাগবত পাঠ দিলা।"

ভট্টদেবের 'সৎ সম্প্রদায় কথা'য় আছে "চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁকাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পরাই রত্ন পাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পরিবে দিলা।"

ভাগবত পাঠককে সম্মান দান করা শ্রীচৈতন্য জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা। শ্রীচৈতন্য আসামের রত্নেশ্বর বিপ্রকে 'রত্নপাঠক', বঙ্গদেশের বরাহনগরের ভাগবত পাঠক পণ্ডিতকে 'ভাগবতাচার্য' এবং উড়িষ্যায় ভাগবত পাঠক জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' উপাধি দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ভাগবতাচার্য প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন –

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।

আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য' ।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য।।"

[চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য ৫/১১০-১২০]

আসাম ও বঙ্গদেশের মত উড়িষ্যাতেও শ্রীচৈতন্য ভাগবত চর্চার ক্ষেত্রে নবপ্রেরণা দান করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার নব অভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শ্রীচৈতন্য। অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি যথার্থ লিখেছেন-"পুণ্যভূমি উৎকল খণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পরিকরবর্গ।...পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা - বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতঙ্ক মতরে যেমানে প্রভুঙ্কর অন্তরঙ্গ সখা।" ['ব্রহ্মশাঙ্কুলী ও অণাকার সংহিতা', ভূমিকা]

ওড়িয়া ভক্ত কবি ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে, চৈতন্য প্রেরণাতেই পঞ্চসখা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। -

জন জনরে শাড়ী দেই। কহন্তি চৈতন্য গোঁসাই।
পুরাণ গীতরস কর। যাহা লেখিব গ্রন্থকার।
অবতারিক যেতে কথা। লিখন কর শাস্ত্রপোথা। ...
পঞ্চশাখা এ নীলগিরি। সেবা করন্তি দেবহরি।
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গীত প্রকাশ।

[চৈতন্য ভাগবত, ৫৪ অধ্যায়]

তিনি পঞ্চসখাকে গ্রন্থাদি রচনায় উৎসাহিত করেছেন, আবার কে কি লিখলেন, সে বিষয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন।

'কটকে চৈতন্য গোঁসাই। আনন্দে হরষিত হোই।

পঞ্চসখাঙ্কু আজ্ঞা দেলে। কি গ্রন্থ করিছ বোইলে'।

উত্তরে পঞ্চসখা জানালেন তাঁরা কে কি গ্রন্থ করেছেন। জগন্নাথ দাস জানালেন ভাগবত অনুবাদের কথা-

চৌষধি অধ্যা ভাগবত। সে অটে পুরাণ উকত।
শুনি হরষ শ্রীচৈতন্য। গোলোক প্রেম রসস্নান।

দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, জগন্নাথ দাসের ভাগবত পুরাণ পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গনবদ্ধ করে রাখলেন। আঢ়াই দিবস পর্যন্ত। বেনি রহিলে প্রেমচিত্ত'। আড়াই দিন পর্যন্ত তাঁরা দুজনে সপ্রেমে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রইলেন।

মহাপ্রভুর এই ভাগবত প্রীতির মূলে সম্ভবত নিম্নোক্ত কারণগুলি ছিল - প্রথমত, ভাগবতে পরমতত্ত্বের যে অলৌকিক রসমণ্ডিত রূপায়ন দেখা যায়, মহাপ্রভু ছিলেন সেই রসের রসিক। বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, রায় রামানন্দের নাটকগীতিতে এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদে সেই লীলারসই আস্বাদ করতেন তিনি। দ্বিতীয়ত ভাগবতে ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ উভয়বিধ রূপের কথা আছে। অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণবাদী। দ্বৈতবাদীরা সগুণবাদী। উভয় পন্থার সমন্বয় করেছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা। মহাপ্রভু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। ভাগবত এই দর্শনের পরিপোষক গ্রন্থ। তৃতীয়ত, মহাপ্রভু নির্বিকল্প মুক্তির চেয়ে ভক্তিকে উঁচু আসন দিয়েছেন – এ শিক্ষারও মূল ভাগবত। চতুর্থত, ভাগবতে বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা থাকলেও বর্ণাশ্রম লঙ্ঘনের কথাও আছে। 'ভক্তি পথে স্ত্রীশূদ্র ধরে অধিকার'- ভাগবতের (১১/২৯) এই উপদেশ মহাপ্রভু শিরোধার্য করেছিলেন।

মহাপ্রভু নির্দেশিত পন্থায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেছিলেন কবি কর্ণপুরের গুরু শ্রীনাথ চক্রবর্তী। শ্রীনাথ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা'র প্রস্তাবনায় লিখেছেন - "শাস্ত্রং

ভাগবতং প্রমাণ মমকং প্রেমাপুমর্থো মহানিথং গৌর মহাপ্রভোমর্ত মতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ ।" ১

মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীর ভাগবত ভাষ্যের সম্মান করতেন - শ্রীনাথ ও শ্রীধর ভাষ্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।

'শ্রীধরস্বামিপাদানাং জীয়াদ ভাবার্থ দীপিকা।
আলোকেন যদীয়েন সর্বঃ পন্থা বিলোক্যতে'।। ২

শ্রীধর স্বামীর 'ভাবার্থ দীপিকা'র আলোয় সব পথ দেখা যায়- এর তাৎপর্য হল শ্রীধর স্বামী ছিলেন সমন্বয়বাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এই সমন্বয় ভাব শ্রীনাথের ভাষ্যের মত শ্রীসনাতন গোস্বামীর রচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ভাগবত-ভিত্তিক গ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলাস্তবে' প্রকাশ শক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা -

'জয় কৃষ্ণ পরব্রহ্মন্ জগত্তত্ত্ব জগন্ময়।
অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশাখিলাশ্রয়।। ৩। কৃষ্ণলীলা স্তব

সেই পরমতত্ত্বকে আবার বলা হয়েছে অব্যক্ত, নির্বিকার, অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, সন্মাত্র পরম জ্যোতি ও অক্ষর।–

নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন।
অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতিরক্ষর।। ৪। তদেব।

এই সমন্বয় ভাবই দেখা যায় চৈতন্যপন্থী ওড়িয়া বৈষ্ণব অচ্যুতানন্দের রচনায়। তাঁর 'নিত্যরাহাস' বা 'নিত্যরাস' কাব্যে দেখা যায় এই নির্বিশেষ নিরঞ্জন ও সচ্চিদানন্দের সমন্বয়-

"কোটি কোটি বিষ্ণু যহিঁরু জন্ম, রাধাকৃষ্ণঙ্কর যে নিত্যস্থান। ...
সখিনো পাদপদ্মে সেধিবা, রাধাঅঙ্গরু অমৃত পিইবা।
নানা লীলারস উদয় তহিঁ, এথিরু আউ অধিক নাহিঁ।
সখিনো সেহি রূপ ক্ষরুছি, শূন্যরে দেবী গুপতে রহিছি।"

অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'র মধ্যেও এই সমন্বয় –

"দেখিবি মুঁ নিত্যকৃষ্ণ প্রেমরাধা অঙ্গ !
শূন্যবর বোলি সিনা বোলন্তি কৃষ্ণঙ্কু।
বারি কহি দেলু ধ্যায় তু নিরাকারঙ্কু।।" - দশম সর্গ

ভাগবতে পরমতত্ত্ব একাধারে নির্গুণ ও সগুণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, রূপ ও অরূপ, শূন্য ও পূর্ণ, নিত্য ও অনিত্য, চিরন্তন ও ক্ষণকালীন, খণ্ড ও অখণ্ড।

সুতরাং উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের শূন্য কৃষ্ণ - একীকরণ ও ভাগবত ভিত্তিক। ভাগবতের এই সমন্বয় ভিত্তির উপরই রচিত হয়েছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমসৌধ - বাঙ্গালী, ওড়িয়া, অসমীয়া তথা সর্বভারতীয় বৈষ্ণবগণ ছিলেন এই প্রেমসৌধের অধিবাসী।

সাহিত্যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সৃষ্টি **ব্রহ্মচারী তুলসী**

ইংরাজীতে একটি কথা আছে – History repeats itself , একবার যা ঘটে তা' আবার অবশ্য ঘটতে পারে, ঘটনা সমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই দিক থেকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলা অসঙ্গত হবে না।

সাহিত্য হচ্ছে মানব মনের মুকুর এবং সমাজ জীবনের প্রকৃত মাপ কাঠি। সমাজের সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সমাজ জীবন ও মানব জীবনের বাস্তব ঘটনা সমুহকে অবলম্বন করে সাহিত্যের অবতারণা ঘটে। সাহিত্য সমাজের প্রতিবিম্ব। আবার সাহিত্যের অনুকরণে সমাজ জীবন তৈরী হয়। কেননা, সাহিত্যে সৃষ্টি গুণ আছে এ কথা সর্বজন সম্মত। সাহিত্য সৃষ্টি গুণে সমৃদ্ধ না হলে সার্থক সাহিত্য হয় না।

সাহিত্য শব্দের অর্থ হল হিত সাধনা করা। হিতেন সহ – সহিত + ষ্ণ প্রত্যয় করে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সমাজকে বাদ দিয়ে কখনো সৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। তাতে সাহিত্য মানবিক সত্তা হারিয়ে ফেলে। যে সাহিত্যকে আশ্রয় করে জীবন গড়ে ওঠে, সেই সাহিত্য সমাজ-স্পর্শ-কাতর সংবেদনশীল, জীবন ধর্মী। সাহিত্য স্নিগ্ধ আনন্দ ঘন জীবন রূপায়নে সমর্থ।

সাহিত্য শিল্পের দুটি রূপ - একটি বাস্তববাদী (Realistic) সাহিত্য, অপরটি আদর্শবাদী (Idealistic)। বাস্তব ঘটনা যখন রসঘন সুবিহিত ও শৃঙ্খলিত অবস্থা আশ্রয় করে কবি প্রতিভার প্রভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সাহিত্যকে নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। বাস্তব সাহিত্য আর কিছুই নয় – মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্না, আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ ও কামনা বাসনার বিচিত্রানুভূতির অভিব্যক্তি।

সাহিত্য সমাজকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ মনের স্বাধীন গতি পথে বিষয় বৈচিত্র, রচনা ভঙ্গি ও কল্পনার ঐশ্বর্যে এক অবাস্তব স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করতে পারে। রসপিপাসু মনের সৃজন ক্ষমতা কে বলা হয় কল্পনা। কল্পনার দ্বারা শিল্পী-মানস যা কিছু দেখে শুনে অনুভব করে তাহাই প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল করে ভাষার লালিত্য, মাধুর্যে ও সৌন্দর্যের সমাহারে বাস্তবসম্মত করে তোলে। সাহিত্যে ইহার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সাহিত্য শিল্প –চেতনার উৎস ভূমি। চরিত্র সৃষ্টির কলা কৌশলে, ভাবের ব্যঞ্জনা ও অর্থের গভীরতায় বাস্তব রসে সঞ্জীবিত করে বলে সাহিত্য একটি ‘Great Art’ বা মহৎ শিল্প। সেই মহৎ শিল্পের মূলে আছে জগৎ রহস্যের মূল উপাদান বস্তু - বিশ্ব-প্রকৃতি প্রেম। সাহিত্যিকরা শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় আনন্দ পরিবেশন করেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বে আনন্দ আহরণ করতে গিয়ে মানুষ যখন সাহিত্যের দিকে নজর দেয়, তখন উন্মুক্ত কল্পনার অতীন্দ্রিয় মানসের সৌন্দর্য ভূষিত সাহিত্যের প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, মহৎ সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায় সীমার মাঝে অসীম লোকের ঝঙ্কার -

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

এখানে শিল্প মানব জীবনের অথবা বিশ্ব প্রকৃতির অনুকরণ করে নাই। সাহিত্যের নীতি এখানে সমাজ নীতি হতে আরও ব্যাপক এবং উদার। তাই বলে সাহিত্যিকরা শাশ্বত জীবন নীতি অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা বিশ্ব প্রকৃতিরই অংশ। শিল্প জীবনের ক্ষুদ্র গন্ডীকে লঙ্ঘন করে আনে শাশ্বত মানব মনের আনন্দ পরিতৃপ্তির উদ্দীপনা। এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক শরৎ চন্দ্রের উক্তিটি সকলেরই প্রণিধান যোগ্য - যা অসুন্দর, যা immortal, যা অকল্যাণ কিছুতেই তা সাহিত্যের ধর্ম নয়। 'Art for Art sake'- কথাটা যদি সত্য হয় তা হলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণ হতে পারে না।

অধ্যাত্ম চেতনা কোন দিনও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় মানব চিত্তে বিকার জন্মাতে পারে না। সেখানে প্রজ্বলিত থাকে মানবিক সত্তার অনির্বাণ আনন্দ দীপ। তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানুষের মন হয়ে ওঠে মুক্তি পাগল। কালের অনুবর্ত্তনে ব্যক্তি জীবনের আশা আনন্দর ধ্যান ধারণাও বদলে যায়। সমাজ যুগের অনুশাসন চক্রের তালে তালে বিবর্তিত হয় এবং জীবন সম্বন্ধে নূতনতর ব্যাখ্যার স্পর্শে সজীবতা লাভ করে। যুগের পরিবর্তনে সমকালীন সমাজের অনুভূতির পরিবর্তনের অভিব্যক্তি ঘটে আদর্শ সাহিত্যে। যদি জীবনোপলব্ধির সত্য চেতনা না থাকে, সাহিত্য নিত্যকালের বস্তু হয়ে থাকতে পারে না। রামায়ণ মহাভারত জীবনোপলব্ধির প্রাণময় স্বীকৃতি দিয়ে সাহিত্য আকারে অমর হয়ে আছে কালের কষ্টি পাথরে।

সুন্দরের উপাসক কীটস্ বলেছিলেন – Truth is beauty, Beauty is Truth - সাহিত্যে সত্যের মূলে রয়েছে শিল্প, শিল্পে সত্যের মূলে রয়েছে সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরের সঙ্গে সত্যের কোন বিরোধ নাই। যাহা সুন্দর তাহাই সত্য আবার তাহাই মঙ্গল।

সাহিত্য মহৎ হলে তার মধ্যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা থাকবেই। আর সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হলে তাতে আনন্দ আসবেই।

সাহিত্যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় কবি সাহিত্যিকের ধ্যান গম্ভীর চিন্তার দ্বারা। বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকের কাব্য সাহিত্যে সৌন্দর্যের আদর্শময় ঔজ্জ্বল্যের স্ফুরণ ঘটেছিল বলেই তাঁরা কালজয়ী মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে জগতে অমর হয়ে আছেন। কালিদাসের মেঘদূত, কুমার সম্ভব, শকুন্তলা কাব্যগুলিতে যেন একটি গভীর তন্ময়তার দ্বারা সুন্দরের উদ্ভব হয়েছে। সেক্সপীয়ারের নাটকে, শেলী, কীটস, মিল্টন ও রবি ঠাকুরের কবিতায়, টলস্টয়, হুগোর উপন্যাসে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কারলাইল, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধেও প্রতিভারূপ সূর্য-রশ্মিপাতে শতদল বিকাশের ন্যায় সুন্দরের উদ্ভব ঘটেছে।

সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে সুগভীর জীবনবোধ জাগ্রত না হলে এবং নিখিল বিশ্বের মঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন না হলে কোন সাহিত্য শিল্পীই তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অমরতার দাবী করতে পারবেন না। যে সাহিত্যের রসানুভূতিকে কেন্দ্র করে সত্য, শিব, সুন্দরের সমাহার ঘটেছে, সেই সাহিত্য কালজয়ী, তাঁর স্থায়িত্বের অবলুপ্তি ঘটতে পারে না এ কথা সর্বাংশে সত্য !

বস্তুর বাস্তবতা সাহিত্যে প্রতীত না হলে সাহিত্য নিরস হয়। অথচ সাহিত্য-শিল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রসমণ্ডিত করা। কিন্তু যখন সমাজের রীতিনীতির মূলাদর্শকে অস্বীকার করে সাহিত্যিকরা রসসর্বস্ব বাস্তবতাকে পরিস্ফূট করার নামে ছত্রে ছত্রে নগ্নতা ও অশ্লীলতা আরোপ করে দেন, তখনই সেই সাহিত্যকে সাগ্রহে বরণ করতে মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

অধুনা শিল্পাদর্শে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাব্যে ভারতীয় সৌন্দর্য্য সাধনার পরিবর্তে এসেছে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি। স্বাধীনতা-উত্তর সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে চেতনায়, মূল্যবোধে, পারিবারিক অ ব্যক্তিগত সম্পর্কে। পরিবর্তনার তাড়নায় বাংলায় সমাজ চিত্র কিছুক্ষেত্রে পূতিগন্ধময় ও বিষসিক্ত হয়ে উঠছে। আবার বিজ্ঞান চেতনার আলোকে শিল্পে নতুন ভাব রাশির

বিচ্ছুরণ ঘটছে। ফরাসী দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও নবাগত শিশুরা অঙ্কুরিত জীবনের প্রথম প্রভাতেই ইন্দ্রিয়ের ঈশারায় প্রতারিত হচ্ছে। প্রকট হচ্ছে বাঙ্গালীর পরিণততর নবীন রূপ – জীবন সমস্যার জ্বালা, অভিযোগের বিক্ষোভ। এই নবীন রূপকে প্রকাশের তাড়নায় কাল-সিন্ধু-সলিলে প্রবাহিত হচ্ছে বাংলা সাহিত্য। মানুষের ব্যক্তি জীবন ও নগ্নতার গোপন রহস্য প্রকাশ্য দিবালোকে বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। পরিবর্তনের জটিলতায় যারা সুকুমার মন নিয়ে বড়ো হতে চাচ্ছে তারাও সুস্থ মনের অধিকারী হতে পারছে না, যার ফলে বয়সের সঙ্গে বিসদৃশ চাপল্য প্রকাশের উচ্ছ্বাস আরো বেড়ে যাচ্ছে।

অর্থের নেশায় লোভাতুর কিছু সাহিত্যিক, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সংযম হারিয়ে সমাজের হিত বা কল্যাণ বোধের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাহিত্যাকারে অমার্জিত রুচি বোধ জাগ্রত করাই যাদের কাজ, উত্তেজনাপ্রদ শব্দ ও বাক্যকে সংবদ্ধ করে অর্থ আহরণ করাই যাদের জীবনের লক্ষ্য, তারা আর সব কিছু হতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক নহেন। সাহিত্যের সৌধ গড়ার স্থলে সত্য শিব সুন্দরের বহিরঙ্গণের উত্তপ্ত রৌদ্র ধূলাতেই তাদের জীবন গড়াতে থাকে, সৌন্দর্য্য নিকেতনে সাহিত্যের সুশীতল স্নিগ্ধচ্ছায় বিশ্রাম তাদের ভাগ্যে ঘটে না।

সৎ সাহিত্য একটি জাতির মুখ দর্পণ। সেই জাতির সৎ সাহিত্য দ্বারাই তার জাতীয় জীবনের নির্মল ও সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে থাকে।

অনেকে বলেন – সাহিত্যে অশ্লীলতা নূতন কিছু নয়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, এমনকী ভারতচন্দ্রের কাব্যেও অশালীনতার পূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। এ কালের সাহিত্যেও থাকবে বৈকি! অতএব একালের সাহিত্যে অশ্লীলতা দোষের হবে কেন?

উত্তরে বলা যায় - দোষ হল প্রয়োগের। মহাকাব্যগুলিতে তথাকথিত অশ্লীলতা একচেটিয়া অধিকার নিয়ে কাব্যের প্রতি পাতায় জুড়ে বসে নি। বিশেষ

সময় বা বিশেষ অবস্থাকে সহজ ভাবে ব্যক্ত করেছে সেই যুগের সামাজিক পরিস্থিতিতে। একচেটিয়া অধিকার নিয়ে জুড়ে বসাটাই সাহিত্য শিল্পের ব্যভিচার। যেমন আমাদের জীবনকাব্যে অদৃশ্য কিছু স্থান আছে। সেই অদৃশ্য স্থানগুলি জীবনের কোন কোন অংশে স্থান পায় মাত্র। তাই বলে সেই স্থানগুলিই আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠেনা, আবরণে আবৃত থাকে। যদি জীবনের প্রতি অংশ প্রকাশিত হত তা'হলে অশ্লীলতাই জীবন যাত্রার মাপকাঠি হতো।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দুর্নীতির যুগ সঙ্কটে জাতীয় জীবনের শক্তি সাহিত্যিকের উপরই নির্ভর করছে। সাহিত্যিকদের আত্মবিস্মৃতি ঘটলে চলবে না। সত্যিকারের শিল্পী সাহিত্যিকের উত্থান চাই। যুগে যুগে এসে তাঁরা ঘুম ভাঙ্গানী গান গেয়ে জাতিকে জাগ্রত করেন। যার ফলে জাতি খুঁজে পায় তার হারানো পথ। জাতির উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক হিসাবে সাহিত্যশিল্পীর জীবনের ব্রত হওয়া প্রয়োজন কল্যাণ বোধের প্রেরণা দান। দেশ ও সমাজের দায়িত্ব সাহিত্যিকগণের সবচেয়ে বেশী। নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার আলোকে জাতিকে নৈতিক বোধে ও আদর্শ সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সৃষ্টি করবে "বাস্তবধর্মী সাহিত্য"।

"মাতঃ দুর্গে কালীরূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রুর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটাও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল, নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ প্রকাশ হও।"

-- শ্রী অরবিন্দ

মহাবলের মহাবালেশ্বর **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহ্যাদি পাহাড়ে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় ৪৫০০ ফুট উচ্চতার ভেন্না লেক-কে ঘিরে প্রায় ১৫০ বর্গ কিলোমিটারের পাহাড়ি শহর মহাবালেশ্বর। বিষ্ণুর হাতে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দেওয়া দৈত্য মহাবলের নামাঙ্কিত এই শহরের গোড়া পত্তন করেন ১৩ শতকের যাদব রাজা সিংহান, মূলত কৃষ্ণা নদীর জল জমিয়ে জলাধার গড়তে। নতুন করে এই শহরকে আবিষ্কার করে ১৮২৪ থেকে ক্রমশঃ তাকে সাজিয়ে তোলেন স্যার জন ম্যালকম। গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট, বাংলোধর্মী বাড়ি, স্যানাটোরিয়াম, জেল এমনকি ব্রিটিশ মুম্বাই প্রেসিডেন্সির গ্রীষ্মাবাসও। গাছ গাছালিতে ছাওয়া মহাবালেশ্বরের স্নিগ্ধরূপ যেমন পর্যটকদের আকর্ষণ করে তেমনি অন্য পাহাড়ি শহরের তুলনায় এই অধিত্যকায় চড়াই-উৎরাই নেই বলে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবার ভ্রামণিকও কম নয়। তবে মহাবালেশ্বরের মজায় মজতে হলে আসতে হবে অক্টোবর থেকে মে মাসের মধ্যে। জুনের প্রথম থেকেই যখন আরব সাগরীয় মৌসুমি বায়ু ঢুকতে শুরু করে তারপর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ে আঝোর ধারায়, তখন সবুজে সাজা পাহাড়ের বুকে আপনা থেকে গজিয়ে ওঠা ঝর্ণার কল্যাণে প্রকৃতি অপরূপা হয় ঠিকই কিন্তু সাধারণ পর্যটকের কাছে তখন এই আকর্ষণীয়া ভয়ঙ্করীও বটে। এহেন মহাবালেশ্বরে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছিল ২২শে জানুয়ারি পুণে থেকে সকাল ঠিক ৮.২০তে। কলকাতা থেকে অবশ্য আকাশে উড়েছিলাম ২১/১ এর শেষ রাতে ভীমাশঙ্কর, মহাবালেশ্বর আর লাভাসার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। প্রথম দিনটায় ভাগ্নী ঝিঙ্কার বাড়িতে থেকে সারাদিনের মোটর দৌড়ে কি ভাবে ভীমার পাশে ভীমাশঙ্কর দেখেছিলাম সে এক অন্য গল্প। আজকে চলার শুরু পরমেশ্বরের উবার চেপে। প্রথমে ১০১ কিলোমিটার দক্ষিণে পঞ্চগনি তারপর আরও ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে মহাবালেশ্বরের একমাত্র MTDC রিসর্টে পৌঁছতে তিন ঘন্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়, কিন্তু পেট্রল পাম্পে CNG'র লাইন আর পঞ্চগনির আগে হঠাৎ তৈরী জ্যাম আমাদের ১২টা ১৫-র আগে রিসেপশন কাউন্টারে পৌঁছাতে দিল না। হনিমুন কাপল অথবা দুজনে কূজন করার

মতলবে কেউ এসে থাকলে MTDC'র এই রিসর্ট একদম আইডিয়াল। হাঁটাপথে মুম্বাই সানসেট পয়েন্ট, লাগোয়া রাজভবনের বাগান থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট, ইচ্ছেমত লাঞ্চ-ডিনার, সর্বোপরি নির্জনতা – এক কথায় দারুণ! তবে অন্যদিক থেকে ভাবলে বাসস্ট্যান্ড কে পাশে রেখে বাজার, এরিয়াও থাকার পক্ষে মন্দ নয়। সারি দিয়ে বিভিন্ন মানের হোটেল, হাতের কাছে দোকান, যখন তখন ইচ্ছে মতো খাবার চাখার সুযোগ, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ঘুরে দেখার ট্যাক্সি খরচা – রিসর্ট থেকে অনেকটাই কম। সে যাই হোক, চেক-ইন করে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ট্যুর প্রোগ্রাম নিয়ে এদের রেজিস্টার্ড ড্রাইভার অজয় এসে হাজির। বাজার অঞ্চলে থাকলে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের ড্রাইভারদের সাথে যে দরদাম করার সুযোগ থাকতো, স্বভাবতঃই এখানে তা নেই। তাই প্রথম দিনটায় ৩০ কিলোমিটার দূরের 'তাপোলা' লেক আর হাঁটা পথের মুম্বাই সান সেট পয়েন্ট দেখাতে ১২০০ টাকা চেয়ে বসলেও বলার কিছু ছিল না – ছাপার অক্ষরে ঐ রেটই যে লেখা আছে। লেক দেখতে আমরা বেড়িয়েছিলাম বেলা ৩.৩০ নাগাদ কারণ তার আগে MTDC'র রেস্টুরেণ্ট রুচিরাতে লাঞ্চের পর ঘণ্টা খানেকের বিশ্রামও দরকার ছিল। রিসর্ট থেকে তাপোলা পর্যন্ত পুরো পথটাই যেন এক কবিতা। সেই কবিতার মাঝে একখানা সেমিকোলন যেন শিউসাগর ভিউ পয়েন্ট। একটু থেমে আঁকাবাঁকা নদীর চলাকে মুগ্ধ চোখে দেখলেও সূর্যের প্রখর তেজ সেখানে যেমন চাই তেমন ফটো তুলতে দিল না। তবে মন ভরে গেল তাপোলা লেকের এন্ট্রি পয়েন্ট পৌঁছে। কোয়েনা নদীর জলকে বেঁধে তৈরী হওয়া এই লেক এখন খ্যাত হয়ে গেছে মিনি কাশ্মীর নামে। ডাল লেকের মতই তাপোলের আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বোঝা যায় না সলশি নদীও কোয়েনার সাথে তাপোলার কোনখানে মিশে গেছে। তবে দু'চোখ ভরে দেখার জন্য বৃহৎ শিউসাগরের অংশ এই আশি মিটার গভীরতার তাপোলায় কোন এন্ট্রি ফি নেই, যদি না কায়াকিং, প্যাডেল বোটিং অথবা জেট স্কিয়িং অ্যাডভেঞ্চারে না মাততে চান। থাকতে চাইলে লেকের পাশেই রয়েছে HOTEL RIVVERIA (07588831119)। অফ সিজনের নির্জনতায় কোয়েনা সলশির ডুয়েট সঙ্গীতে ডুবে

একরাত এখানে কাটাতেই পারেন। আমরা অবশ্য এখানে রাত কাটাইনি তবে লেকের মেজাজ অনুভব করতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিলাম এই রিভেরিয়ার লেক ভিউ ডাইনিং হল থেকেই। ফিরতি পথে শিউসাগর ভিউপয়েন্টে আরেকবার সময় দিয়ে বাস স্ট্যান্ড, রাজভবন পার হয়ে পথের শেষে পৌঁছে যাই মুম্বাই সানসেট পয়েন্টে। সূর্যাস্তের দৃশ্য এখানকার প্রধান আকর্ষণ হলেও খাবার ও বিভিন্ন জিনিষের পসরা নিয়ে এই জমজমাট মেলায় ঘোড়ার পিঠে চেপে অথবা অন্য কোন পোজে সেলফি তোলার হিড়িক দেখলাম বেশি। প্রচণ্ড হৈ চৈ কে পাত্তা না দিয়ে সূর্য যে কখন কালো মেঘকে ফাঁকি দিয়ে সবুজ পাহাড়ের পিছনে ডুবতে বসেছে - সেই অপরূপ দৃশ্যেও যেন অনেকের মন নেই!

পরদিন কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই অজয়ের বাহন আমাদের দরজায় হাজির। মহাবালেশ্বরের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো শহর থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরের কৃষ্ণাবাঈ তথা পঞ্চগঙ্গার মন্দির থেকে। কৃষ্ণা, ভেন্না, কোয়েনা, সাবিত্রী, গায়ত্রী - পাঁচ নদীর জল পাঁচ ধারায় ঝরে পড়ছে পর পর তৈরী করা কুণ্ডতে। পাঁচ দেবীর মন্দিরও তৈরী হয়েছে ১৩ শতকের রাজা সিংহান দ্বারা। তারপর নানা রাজা-মহারাজের পর শিবাজীর হাতে সংস্কার হয় এই মন্দির। পাশেই ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হনুমান মন্দির আর রাম সীতার রাম মন্দির। যে মহাবলের কথা প্রথমেই বলেছি এখানে রয়েছে সেই দুই দৈত্য ভাইয়ের নামে অতিবালেশ্বর ও মহাবালেশ্বর মন্দির। লোকশ্রুতি, দুই দৈত্যের অত্যাচারে জর্জরিত ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে বিষ্ণু এলেন তাদের বধ করতে। অতিবল সহজে মারা পড়লেও মহাবলের বিক্রমে বিষ্ণুও প্রথমে ব্যর্থ হন। পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করে বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু বরণ করে মহাবল। মহাবলের বিক্রমকে স্মরণীয় করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই গড়ে ওঠে মন্দির। মন্দিরের ভূগর্ভে রয়েছে পাণ্ডবদের স্থাপিত শিবলিঙ্গ, যেখানে মহেশ্বর আজ স্বয়ম্ভু রূপে বিরাজমান। জনশ্রুতি, দ্রোণাচার্যের স্বপ্নাদেশকে বাস্তব রূপ দিতেই নাকি পাণ্ডবেরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ভূগর্ভস্থ শিবের মন্দির।

মহাবালেশ্বরের আসল আকর্ষণ তার তিরিশের বেশি ভিউ পয়েন্ট। দু-চারদিন এখানে কাটিয়ে তার সব কটি দেখে নেবো এমন ভাবনাই ভুল। আবার এটাও ঠিক, অভিজ্ঞ ড্রাইভার কাম গাইডেরা যে সমস্ত ভিউ পয়েন্টে নিয়ে যায় তাতে মোটের ওপর এখানকার গিরিখাতের ভূগোল ভালোভাবেই বুঝে নেওয়া যায়। আমাদের দেখা শুরু হয়েছিল ৪৪২০ ফুট উচ্চতার 'আর্থার সিট' পয়েন্ট থেকে। ব্রিটিশ বোম্বাই প্রেসিডেন্ট জর্জ আর্থারের নামাঙ্কিত এই আর্থার সিটের গল্প কিন্তু মন ভারী করে। ব্রিটিশ অভিনেতা আর্থার ম্যালেট তার স্ত্রী কন্যাকে হারিয়েছিলেন সাবিত্রী নদীতে নৌকা দুর্ঘটনায়। তারপর থেকে আর্থার তার প্রিয় ভিউ পয়েন্টে বসে থাকতেন সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে - যদি তারা ফিরে আসেন এই আশায়। লোকশ্রুতি ছিল যে, কোন জিনিষ ছুঁড়ে দিলে তা ফিরিয়ে দেয় এখানকার বাতাস। পরীক্ষা করতে ঝাঁপ দেন ব্রিটিশ অভিনেতা। ফলাফলে জায়গার অন্য নাম হয়ে যায় সুইসাইডাল পয়েন্ট। আর্থার সিট থেকে পায়ে হেঁটে একে একে দেখে নেওয়া যায় হান্টিং, ইকো, উইনডো, ম্যালকম আর টাইগার স্প্রিং পয়েন্ট। এর মধ্যে ইকো পয়েন্টে ভিড় জমায় কচি-কাঁচাদের দল। তাদের সমবেত ধ্বনি যখন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে তখন আর নামের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে না। সাহেবদের প্রিয় শিকার ভূমি ছিল হান্টিং পয়েন্ট, আর ঠাণ্ডা পানীয় জলের টাইগার স্প্রিং-এ নাকি আজও বাঘেরা জল খেতে আসে। মুগ্ধ করে মহাবালেশ্বরের স্থপতির প্রিয় ম্যালকম পয়েন্ট। প্রকৃতির খেয়ালে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ে যেন মাথা গুঁজে শুয়ে আছে এক আদিম কালের ডাইনোসরাস। দেখা যায় সাবিত্রী ভ্যালি, আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তোরানা গড় আর প্রতাপগড় দুর্গ। প্রতিটা ভিউ পয়েন্ট নামে এবং ইতিহাসে আলাদা হলেও দৃশ্য মোটামুটি একই। হলদে গিরিখাতের মাথায় সবুজ প্রলেপ অথবা কোঙ্কন উপত্যকার শোভা সবই দেখেছি অন্য দিক আর ভিন্ন কোণ থেকে – তফাত শুধু এইটুকুই। এই অন্যরকমের ভাবনায় অজয় এরপর যেখানে নিয়ে এল সেটাই 'ক্যাসেল রক' পয়েন্ট। সেখান থেকে সাবিত্রী পয়েন্ট পর্যন্ত হাঁটার পথে আবার মহাবালেশ্বরের গিরিখাত ধরা দেয়

নানা রূপে নানা রঙে। অবাক করে মাংকিস পয়েন্ট। যেখান থেকে দেখা যায় তিন বাঁদরের আদল যারা পণ করছে খারাপ দেখবে না, খারাপ শুনবে না আর খারাপ বলবে না। তবে এটাও সত্যি সবুজের ছোঁয়ায় যে মূর্তি স্পষ্ট হতো এখন শীতের দিনে দেখিয়ে না দিলে তাকে চিনতে পারা শক্ত। এরপর ম্যালকম কন্যা কেটসের নামাঙ্কিত পয়েন্টে চলার পথে অন্ততঃ বিশ মিনিট আমাদের থামিয়ে দিল "আর্চিস ফার্ম"- শুধু স্ট্রবেরি দেখার জন্যই নয়, বাগানে পাতা চেয়ার টেবিলে বসে অসাধারণ স্বাদের স্ট্রবেরি আইসক্রিম জুসে চুমুক দেওয়ার বাহানায় ক্লান্ত শরীরটাকে আবার চাগিয়ে তুলতেও বটে। কেটস পয়েন্টের কাছে রয়েছে আরো এক ইকো পয়েন্ট। আসলে নামে যাই হোক না কেন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় অনেক পয়েন্ট থেকেই। তবে কেটস পয়েন্টের আসল আকর্ষণ সেখান থেকে কৃষ্ণা নদীর ভিউ। একের পর এক গিরিখাতের দৃশ্য যখন ক্রমশঃ নতুন কিছুর দাবী করছিল তখন কেটস পয়েন্ট অবশ্যই সে চাহিদা মিটিয়েছে। নতুনত্ব অবশ্য ছিল 'নিডল হোল' আর 'এলিফেন্ট হেড পয়েন্টেও'। পাহাড় যে ভাবে প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি করেছে সূঁচের ছিদ্র অথবা হাতীর মাথা, তা দেখলে অবাক হতেই হয়। অবশেষে সত্যিকারের ভিন্ন স্বাদ এনে দিল ভেন্না লেক, যার সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল চলন্ত মোটর গাড়ী থেকে। পুণে থেকে পঞ্চগনি হয়ে মহাবালেশ্বরের প্রবেশদ্বার যে এটাই। অধিত্যকার অন্যতম ট্যুরিস্ট আকর্ষণ ৮০ ফুট গভীরতার এই লেক দর্শনীয় তো বটেই, তা ছাড়াও রয়েছে নৌ বিহারের সুবিধা। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকা এই ২৮ একর জলে যদি নৌকায় নাও ভাসেন, শুধু বসে থাকলেও চোখের আরামের সাথে জুড়িয়ে যায় মন-প্রাণ। পরের গন্তব্য ছিল সূর্যোদয় দেখার জন্য আইডিয়াল 'উইলসন পয়েন্ট।' সূর্য অবশ্য এত বেলায় আমাদের জন্য বসে নেই, তবু মহাবালেশ্বরের উচ্চতম স্থান ৪৭১০ ফুট উচ্চতার ভিউ পয়েন্টে সরেজমিন তদন্তের জন্যই একবার পা রাখি। আগামীকাল পঞ্চগনি পরিক্রমার আগে এই সানরাইজ পয়েন্ট যে আমাদের পরিকল্পনাতেই আছে।

আজকের শেষ পয়েন্ট ছিল গণেশ মন্দির। তবে সত্যিকারের অভিযান শুরু হল ঠিক তাঁর পরে, মন্দিরের পিছন থেকে অন্ততঃ ৬০০ মিটার খাড়াই পথ ধরে PLATO পয়েন্টে যাওয়ার সময়। আধা জঙ্গুলে পথে বন্য জন্তুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিশেষতঃ যদি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পড়ন্ত বেলায় সুনসান পথের দুর্গমতায় সন্দেহ ছিল সাথের সাথী শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিতে পারবে কিনা। শেষের ১০০ মিটার তো সত্যিই দুরূহ – অন্ততঃ সিনিয়ার সিটিজেনদের পক্ষে। তবু যে শেষ পর্যন্ত দু'জনেই পৌঁছেছিলাম তাঁর কারণ পায়ের জোর নয়, মনের জোর!

ফিরতি পথে ক্লান্ত শরীরটা যে বাসস্ট্যান্ডের "গন্নে কা রস"-এ এতটা তরতাজা হয়ে উঠবে তা আগে বুঝিনি। তাই আজকের পরিক্রমা MTDC-র দরজায় শেষ হয়ে গেলেও বাংলোর বিশ্রাম আমাদের আটকে রাখতে পারিনি। নাই বা রইলো অজয়ের বাহন, শ্রীচরণের ভরসা তো ছিল। তাই পায়ে পায়ে মুম্বাই পয়েন্টে পৌঁছে আরেকবার সূর্য ডোবার পালা দেখার কোন বাধা ছিল না। এর পরেও রয়েছে আগামী কাল – যেদিন ভোরের আলো দেখতে শুধু উইলসন পয়েন্টেই যাবো না, ব্রেকফাস্টের পর অজয় আবার আমাদের নিয়ে যাবে পাঁচ পাহাড়ের দেশ পঞ্চগণিতে – এবারের মত শেষ পরিক্রমায়।

কোয়েনা ভিউ

ভেন্না লেক

পঞ্চগঙ্গা মন্দির

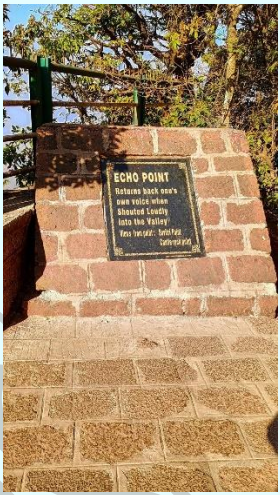

ইকো পয়েন্ট

প্রতাপ গড়

ভিউ পয়েন্ট

ভেন্না লেক

প্ল্যাটুর মাথায়

ছবির দেশে **শ্রী মুক্তিনাথ গুপ্ত**

খেলাধূলায়, ছবি আঁকায়, গল্প শুনতে অশোকের জুড়ি নেই। কিন্তু পড়তে বসলেই তাঁর নানান কথা মনে পড়ে, কান্না পায়, মাঝে মাঝে ঘুমও আসে। বাবা-মায়ের একমাত্র নয়নের মণি! সে যখন যা চায়, তাই পায়। কোন কিছুরই অভাব নেই তার। মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ে, কিন্তু তাঁর চারজন মাষ্টারমশাই আছেন। সকালে, রাত্রে তাঁরা নিয়মিত আসেন। পড়ান। অশোক তাঁদের পড়া শোনে, নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই শোনে। তাতেই কোন রকমে পরীক্ষার ঝকমারি কাটিয়ে উঠেছে এতদিন। তবে অশোকের একটি গুণ আছে। সে যা একবার শোনে, তা ভুলতে তাঁর অনেক দেরী হয়। এই গুণেই বোধহয় পরীক্ষার বৈতরণী পেরোতে তাঁর খুব ক্লেশ পেতে হয় না। কিন্তু কোন বইয়ে কি আছে তা জিজ্ঞেস করলে অশোকের কোনদিনই পাশ করা হত কিনা সন্দেহ।

একদিন সকালবেলা মাষ্টারমশাই চলে যাওয়ার পর অশোকের নজর পড়ল, একটা সুন্দর ছবির বই তার টেবিলের এককোণে রাখা আছে।

বইটা দেখতে ভারী সুন্দর। ছবিগুলোও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। কিন্তু বইটা কাছে টেনে নিয়ে প্রথম ছবিটি দেখেই তার কিরকম একটি অদ্ভুত শিহরণ জাগে।

ছবিটা বেশ বড়। একটা পদ্মপুকুর। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ্ম ফুটে আছে তাতে। পুকুরের পাশেই একটা বিরাট ঝাঁকাল গাছ। পুকুরের ওপাশে জঙ্গল, তারপরেই দূরে বরফের টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশ্রেণী। রোদ উঠেছে। সেই পর্বতশ্রেণীর মাথার উপরে নানান রঙের মেলা। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সেই ছবিটা দেখতে দেখতে অশোক চলে যায় ঐ ছবির রাজ্যে। তার গায়ে যেন পদ্মের হাওয়া লাগতে থাকে, সে যেনো পদ্মের সৌরভ পায়। ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় ঐ গাছটার তলায়।

একটা ঝিরঝিরে হাওয়া এসে অশোকের চোখে মুখে লাগে, পদ্মের সুবাসে কিরকম এলোমেলো হয়ে যায় চিন্তাগুলো। মনে হয় যেন পদ্মগুলো পাপড়ি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের কথাও যেন শুনতে পায় অশোক। সামনেই হাতের কাছের পদ্মটি মাথা দুলিয়ে বলে ওঠে, "রাজকুমার, আমাকে তোমার হাতে নাও, দেখবে তোমার সব পুরনো কথা মনে পড়বে।"

তাকে রাজকুমার বলছে শুনে সে নিজের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে – এ কি! কত বড় হয়ে উঠেছে সে ! তাঁর গায়ে রাজার ছেলের পোষাক, পায়ে জরীর জুতো, কোমরে তলোয়ার, মাথায় যুবরাজের উষ্ণীষ!

অশোক পদ্মটিকে তুলে নিতেই দেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া। পদ্ম বলে, "ওঠো ঐ পক্ষীরাজ ঘোড়ায়। তোমায় যে অনেক দূর যেতে হবে।"

অশোক ভুলে যায়, সে কে ! মনে হয়, সত্যিই তো আমি রাজকুমার।

পক্ষীরাজ ঘোড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে মাথা নাড়ে আনন্দে। আর দেরী না করে অশোক উঠে বসে পক্ষীরাজের পিঠে। কি মজা ! ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে পক্ষীরাজ ডানা মেলে দেয় শূন্যে। উড়ে চলে কত পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র পেরিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা পাহাড় ঘেরা বিস্তৃত অঞ্চলে নামতে থাকে পক্ষীরাজ। অশোক নীচে চেয়ে দেখে একটা বিরাট পুরী, কিন্তু নিস্তব্ধ। দেখেই তার মনে পড়ে ঠাকুমার কাছে শোনা নির্জন পুরীর কথা। সেখানে সবাই ঘুমন্ত। দ্বারী থেকে আরম্ভ করে রাজকুমারী পর্যন্ত সেখানে ঘুমন্ত। হয়ত কোনও মায়াবলে তারা ঘুমিয়ে আছে। কোনও এক অচিন দেশের রাজপুত্র গিয়ে জাগাবে রাজকন্যাকে, আর তাঁর সঙ্গে জেগে উঠবে সবাই।

অশোক ভাবে সেও তো রাজকুমার। তাকেই বোধহয় জাগাতে হবে এই পুরীকে। হয়তো এটাও কোনও ঘুমন্ত পুরী।

পক্ষীরাজ মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়ে সে। সামনেই রাজবাড়ী। বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়ে ভেতরে। মহলের পর মহল পেরিয়ে যায়, কিন্তু কৈ, একটা লোকও তো নেই! রাজার ঘরগুলো সব শূন্য, কেউ নেই। বিছানা, পালঙ্ক সবই আছে, যেন বহুদিনই পড়ে আছে তারা একই ভাবে। একটু ভয় ভয় লাগে। ভাবে কি করবে। বেরিয়ে আসে রাজপ্রাসাদের বাইরে।

তখন অশোকের হাতের পদ্ম আবার কথা বলে, "কি ভাবছো রাজকুমার? সামনে তাকিয়ে দেখ। ঐ দূরে পাহাড়ের কাছে বিশাল প্রান্তরের দিকে চল, তারা যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে!"

অশোক আবার পক্ষীরাজে চেপে চলে যায় দূরের পাহাড়ের দিকে। খানিক পরেই গিয়ে নামে সেখানে। কি অদ্ভূত!

সেখানে হাজার হাজার ভেড়া চরছিল। রাজকুমার সেখানে নামার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই তাকিয়ে থাকে রাজকুমারের দিকে। অশোকের খুব ভালো লাগে দেখতে। সে আদর করে কাছে টেনে নেয় একটা বাচ্চাকে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে সেই বাচ্চা ভেড়াটি একটা ফুটফুটে চার পাঁচ বছরের ছেলেয় পরিণত হয়।

সে হাতজোড় করে নমস্কার করে রাজকুমারকে।

তখন সেই পদ্মফুলটি বলে- "রাজকুমার, তোমার পাশের এই দীঘির জল নিয়ে ছিটিয়ে দাও ওদের গায়ে, ওরা আবার ওদের রূপ ফিরে পাবে।"

অশোক সেই পদ্মফুলকে ডোবায় সেই দীঘিতে আর ছিটিয়ে দেয় সেই জল তাদের ওপর। ভেড়াগুলো মানুষ হয়ে রাজকুমারকে নমস্কার করে চলে যায় নির্জন পুরীর দিকে। সবার শেষে মানুষ হলেন সেই দেশের রাজা। মানুষ হয়েই সেই বৃদ্ধ রাজা জড়িয়ে ধরলেন রাজকুমারকে। এতক্ষণ রাজার জন্য তাঁর রাণী, রাজকন্যা, মন্ত্রী, অমাত্যরা অপেক্ষা করছিল রাজকুমারের কাছেই। এবার তারা যোগ দিল রাজার সঙ্গে।

রাজা বললেন, "তুমি আমাদের মানুষের রূপ ফিরিয়ে দিয়েছ রাজকুমার, তুমি আমাদের নতুন জন্ম দিলে।"

অশোক তখন বলল, "আমার কর্তব্য আমি করেছি মহারাজ। এবার আমি যাই।"

"সে কি রাজকুমার! আজ এই শুভদিনে তোমায় ছাড়ি কি করে বলো ? লোক গেছে, এখুনি আমাদের রথ আসবে। তোমায় নিয়ে যাব আমরা। এক হাজার বছর ধরে মায়া দৈত্য আমাদের ভেড়া করে রেখেছিল। বলেছিল – এক হাজার বছর পরে অচিন দেশের রাজকুমার আসবে তোদের দেশে, তখন তোরা উদ্ধার পাবি। আজ আমরা আবার মানুষ হলাম। তিনদিন তিনরাত্রি আমরা উৎসব করব। চল রাজকুমার, তুমি না গেলে আমাদের অভিশাপ কাটবে না।"

"চলুন মহারাজ আমি যাচ্ছি। আমার তো পক্ষীরাজ আছে।। আপনারা রথে যান, আমি আসছি।"

তিনদিন, তিনরাত্রি পরে মহারাজ বললেন, "আমি বৃদ্ধ। রাজকুমার, তুমি আমার একমাত্র কন্যাকে গ্রহণ করে এখানকার রাজ্যের ভার নাও।"

এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে লাগে অশোকের চোখে মুখে। ছবির পাতাটা উলটে যায়। অশোক তাঁর মায়ের ডাক শুনতে পায় – "কি রে, ইস্কুল যাবি না? অনেক বেলা হয়ে গেল যে !"

অশোক মায়ের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে সে তার ঘরে বসে আছে।

বলে, "হ্যাঁ মা, চলো।"

একাকী জীবন

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া

একদিন উচ্ছল চঞ্চল জীবন
এক জায়গায় এসে থেমে যায়—
সামনে তার রাস্তা খোলা –
তবু সে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে।
সে জানতো জীবনে এত দূর পর্যন্ত
তাকে চলতে হবে, তাই এইটুকু
সে পেরিয়ে এসেছে সদর্পে সগর্বে।
কিন্তু এখন সে কোন পথে যাবে?
হাত ধরে সবাইকে সে নিয়ে চলে এসেছে,
আজ তার হাত কে ধরবে?
কার উপর সে ভরসা করবে?
যে পা দুটি ফুলের উপর চলত
সে পা দুটি আজ কাঁটার ঘায়ে রক্ত রঞ্জিত---
সামনে পিছনে যতদূর দেখে কেউ নেই তার কাছে।
মনে হয় এত বড় পৃথিবীতে একাই সে চলেছে।
চিৎকার করে ডাকতে চায় সে –
“ওরে আয়রে আমার কাছে ----”
স্তব্ধ বাতাস কেঁপে ওঠে, পাহাড় শোনায় প্রতিধ্বনি –
“আয়রে আমার কাছে ---” !
মাটির উপর বসে পড়ে সে,
মুখ ঢাকে দুই হাতে ।
ভিতর থেকে প্রাণ ডেকে বলে –
“আমি আছি তোর সাথে।”

নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ

সুনন্দন ঘোষ

শিক্ষকের রক্ত লাগছে কোতোয়ালের বুটে,
ডাক্তারের রক্ত ধুয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের বেসিনে।
জেলখাটা প্রতারক প্রবচন শোনাচ্ছে দূরদর্শনের পর্দায়।
উচ্ছিষ্টের লোভে চেয়ার মুছছে বুদ্ধিবিক্রেতা।

সর্বংসহ নীলকণ্ঠ আমরা;
কণ্ঠে হলাহল নিয়ে
রুদ্ধ আমাদের বাক্।
বুকের মধ্যে তুষের আগুন ছাইচাপা !

সীমানার ওপারে ঝরছে শাসকের রক্ত, জ্বলছে শাসনকক্ষ ।
তার আঁচ ছড়াচ্ছে নীরবে।
উত্তাপ আনবে রূপান্তর।
বৃহন্নলার বেশ ছেড়ে অর্জুন তুলে নেবে
গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণীর।

আর ধিকিধিকি জ্বলা নয়।
কিরীটীর বাণে বিলীন হবে খাণ্ডব বন - অগ্নির গ্রাসে ।
সৃষ্টি হবে নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ।

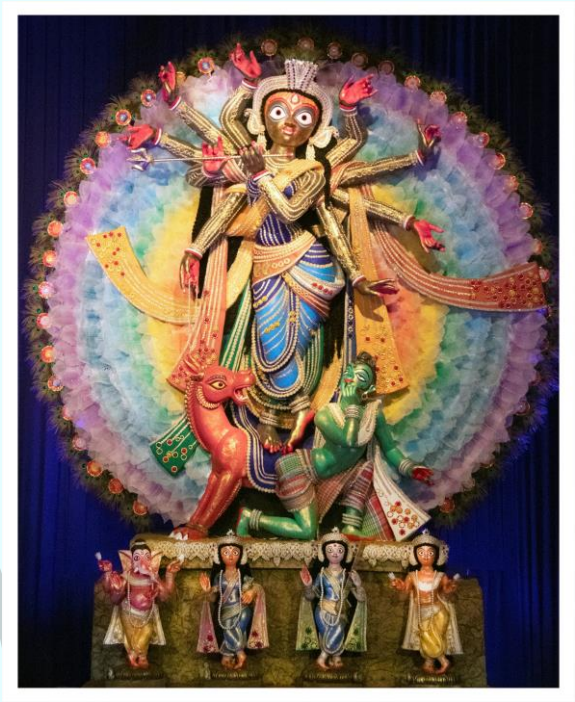

শারদীয়া দুর্গাপূজা ও দীপাবলীর প্রাক্কালে
পার্থসারথির পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দকে জানাই
পার্থসারথি পরিবারের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।